বন্দুক, ক্ষমতা এবং- - -

সসীমকুমার বাড়ৈ

জাঁদরেল পুলিশ অফিসারটা মারা গেল। না কোন বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়নি, প্রাকৃতিক নিয়মেই মৃত্যু। উন্নতির শিখরে পৌঁছে অবসর। শুধু পারেনি বার্ধক্যকে অস্বীকার করতে। সে বিশ্বাস করত মানুষ খুব তাড়াতাড়িই বার্ধক্যকে তাড়িয়ে দেবে বিজ্ঞানের যাদু বলে। এবং তার অপরিহার্য্যতা স্বীকার করবে সবাই। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন। শুনে কেঁদেই ফেলেছিল রীতা। নিজের কাছেও তার কান্নার ব্যাখ্যা ছিল না। তাহলে কি আনন্দদের কান্না। একটা রক্তপিশাচের মৃত্যু। নরখাদক নখ, দাঁত জ্বলে পুড়ে খাঁ খাঁ হয়ে গিয়েছে। এর পরেও নাকি অস্তিতে কেউ না কেউ শান্তি জল দিয়েছে। দু'চারটা শোক সভা। পুলিশে এমন লোক নাকি কমই আসে। অথচ হৃদয় জলের মধ্যেও একটা আগুন জ্বলতে পারে, কি করে বুঝবে রীতা? বুকের মধ্যে দাউ দাউ। সে আগুন কখনও নেভে?

রীতার হিট লিষ্টে দুটো মানুষ। তিরিশ বছর ধরে রোমে রোমে পুঁতে রাখা। এক নম্বর ব্যক্তি ফস্কেই গেল। কতবার বাগে পাওয়া গেছে। তার সশস্ত্র বা নিরস্ত্র অবস্থায় কি আসে যায়। রীতার ধারণা ছিল তার নিরস্ত্রই, অস্ত্র হয়ে উঠবে। ওঁরা যদি ঘাতক দালার নির্মুল কমিটি গড়ে অসংখ্য রাজকবরের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। মুক্ত মঞ্চে ঘোষণা হয় ঘাতক গোলাম আজমের মৃত্যু পরোয়ানা। একজন পুলিশ অফিসার কি তার থেকেও শক্তিমান? বিশ্বাস ছিল একটু একটু করে উত্তাল মানুষ তাকে নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহায়। রীতাকে জিষ্ণু বলত-জানিস দিদি, মানুষের বড় অসুখ– ক্রমিক সুখে আচ্ছন্ন। জিষ্ণু মানুষের আচ্ছন্ন সুখ ভাঙতে চেয়েছিল। রীতার চেয়ে দু বছরের ছোট জিষ্ণু প্রেসিডেন্সির ছাত্র। প্রতিদিনের পাল্টে যাওয়া রীতার চোখের সামনে। রাতে এ ঘণ্টা দিতেই হবে ভাইকে। জিষ্ণু যেন মাস্টারমশাই। রীতা তার বাধ্য ছাত্রী। বুঝলি বুদ্ধিজীবিরাই নেতৃত্ব দেন। আমাদের নেতৃত্বে লড়াই করবে শ্রমিক কৃষক। দেখ দিদি, প্রায় সব দেশেই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছে বুদ্ধিজীবিরা। আমরা বুদ্ধিজীবিরাও সর্বহারা। বা চমৎকার যুক্তিতো। নিজেদের সুবিধা মতো কিছু একটা দাঁড় করালেই হল? কেন আমাকে তোর বুদ্ধিজীবি ভাবতে অসুবিধা হয়! আমি ইচ্ছা করলেই তোদের লেকচারারদের মতো একজন হয়ে যেতে পারি। ডাক্তার হতে পারি। তুই জানিস- মাও জেদং ফিদেল কাস্ত্রোর চেগুয়েরের পেশাগত জীবন। মেধাটাই আসল কথা। মানুষগুলোর আচ্ছন্ন সুখ এড়াতে দরকার বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব। রীতার ধারণা ধাক্কা খায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা মার্কসবাদ পড়েছে, কিন্তু জিষ্ণুর বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব তত্ত্ব সে বোঝে না। তার তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা তাকে স্রোতের মতো টানে। ভাই-এর চুলের মুঠি ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে- যাও, এবার নিজের পড়াশুনাটি কর।

তুমি!

চিনতে পেরেছ।

তোমাকে কে না চেনে। তুমি তো সেলিব্রিটি।

তা বলতে পার। মিডিয়ার কল্যাণে দরজায় দাঁড়িয়ে রাখবে। বসতে বলবে না। রীতা সরে দাঁড়ায়। অশেষ একটু ঝুঁকে হাঁটে। সেই অশেষ এলো অবশেষে। বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এখন কি চায় অশেষ। একজন তুচ্ছ স্কুল শিক্ষিকার কাছে বিখ্যাত অশেষের কি-ই বা পাওয়ার থাকতে পারে, সোফায় বসে আছে অশেষ। সাদা চুলেরই পাল্লাভারী। আরো ফর্সা হয়েছে। চামড়ায় ঢেউ ধরেছে সামান্য।

রীতা দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসল। বাড়ীতে আর আছে সরস্বতী। কাজের মেয়ে, কাজের মেয়ে বললে ভুল হবে। সরস্বতী যের এ বাড়িরই মেয়ে। সরস্বতী এখন মগ্ন হয়ে আছে টি.ভি.র পর্দায়। ছোটাচ্ছে আশা।

তা বল কেন এলে এতোদিন পরে?

ক'দিন হলো তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আসলে মাঝে মাঝে অতীত বর্তমান দ্বন্দ্ব লেগে যায়।

অতীত তো তোমাকে কিছু দেয়নি। তুমি এখন একেবারেই বিপরীত মেরুতে। তোমার বিশ্বাস ভারসাম্যহীন উন্নতিতে। ভুমি সংস্কারে, উৎপাদন হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ভূমিকায় তোমার কাছে পুলিশ, তোমার সমর্থকও কম নেই।

রীতা ওসব কথা থাক। আমি এসেছি শুধু তোমার কাছে।

এখন তো তুমি শুধু নেওয়া দেওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাস কর।

আমার কি আছে।

অশেষ ডুবে যায় এক নৈঃশব্দ নিঃসঙ্গতায়। ঠিক, তার জীবন ভয়ে আছে কোলাহলে। রীতা ও সে দুই মেরুর পথিক । কিন্তু রীতার উষ্ণতা শরীর ও মনের গভীর অনুভূতিতে গাঁথা ছিলই।নারী যদিও তার জীবনে কম আসেনি। এখনও আসে। শরীরের টানে নয়। ক্ষমতার টানে। কিন্তু কি অদ্ভুত স্রোতে বয়ে যায় রীতা। অশেষের চোখে আবিষ্ট ভাব–

আমরা কি অতীতে ফিরে যেতে পারি না রীতা?

অতীতে কখনও ফেরা যায়। ত্রিশ বত্রিশটা বছর তো কম নয় অশেষ। দেখ তুমি-আমি এখন কেউই বিশ্বাস করি না চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। আমি একটা বামপন্থী দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য। জানি আমার ও কোন আদর্শে বিশ্বাস নেই। স্থিতাবস্থা আর ছত্রছায়া দুটোই এখন আমার বড় বেশী দরকার।

রাজনীতির কথা শুনে শুনে গা ঘিন ঘিন করে। আমাদের আর কোন কথা থাকতে পারে না?

তুমি মেয়েদের শরীর চেন। তাদের রোমে রোমে হাঁটতে তুমি অশেষ, তোমাকে আমি একটু দেরীতে চিনেছিলাম। বয়সের অবাধ্য রোগ আমার ও ছিল। যখন নেশা কাটল ততদিনে তুমি আমার শরীর মন দুটোই চিনে ফেলেছ। এখন আর কিই বা পাবে এই পোড়া শরীরে। মাঝে মাঝে একটু আধটু সময়তো দেবে।

সাগরী বাড়িতে সময়ের কোন অভাব নেই। রীতার স্কুল আর বাড়ি। সরস্বতী যতিনের মেয়ে। যতীন একদিন মেয়েটাকে হঠাৎ নিয়ে এসে বলেছিল–দিদি মেয়েটাকে রাখ। তোমার ফাইফরমাস খাটবে। তখন সাত কি আট বছরের মেয়ে সরস্বতী। আস্তে আস্তে বাড়ির মেয়ে হয়ে গেছে সরস্বতী। যতীন মাস গেলে টাকা নিয়ে যায়। বলে সরস্বতী তোমার মেয়ে। আমি গরীব মানুষ। টাকা নিতে লজ্জা করে। কিন্তু কি করব দিদি, গ্রামে যে এখনও চার চারটা মেয়ে আছে। আমি একটা অমানুষ। ছেলে ছেলে করে পাঁচটার জন্ম দিলাম। সরস্বতী ছোটাচ্ছে আশায় দিন বাঁধে। সকালের রান্না সে করে, বিকালেরটা চাপিয়ে দেয় রীতার উপর। রীতা সরস্বতীকে ঘিরেই প্রাণের স্পন্দন পায়। প্রোফেসার নিখিলেশ সাগরীর বাড়িতে রাত বাড়ার সাথে সাথে দ্বন্দ্বগুলো প্রকট হয়ে যায়। বিষয়টা জিষ্ণুর মৃত্যু। শূন্যতা শুরু হয়েছিল জিষ্ণুর মৃত্যু দিয়েই। শোক যন্ত্রণায় নিখিলেশ স্বামী-স্ত্রীতে একটু একটু করে ক্ষয়ে গেলেন। সরস্বতী ঘুমিয়ে পড়ার পর অন্ধকারে খুলে যায় এক একটা রীল। রীতার চোখে ঘুম আসে না।

পূর্ব সিঁথি তখন সংবাদের শিরোনামে। স্কুল কলেজ জ্বলছে-বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস চাই। দিশাহীন কতকগুলো স্বপ্নাতুর যুবক আর বুটের শব্দ। মায়েরা লুকিয়ে কাঁদত– পাছে পুলিশ জেনে ফেলে কার বাড়ির লাশ। দীপঙ্কর মাইতির লাশ পড়েছিল দু'দিন মতিঝিলে।, মেদিনীপুর থেকে বাবা এসে গোপনে দেখে গেছিল। চাষের জমিতে বৃষ্টি হয়ে পড়ত তার চোখের জল। রীতার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে সেই রাতটা–

রাত তখন পৌনে এগারোটা, কড়া নাড়ার শব্দ।

কে?

দরজা খোল রীতা। আমি অশেষ ভয়ার্ত গলা। দরজা খুলতেই হাত বাড়িয়ে দিল অশেষ।

লুকিয়ে রেখ প্যাকেটটা। তোমার বাবা কি জেগে আছে?
না, কেন বলতো?
শোন আমার আর সময় নেই। তবু বলে যাই আমাদের বড় বিপদ। জিষ্ণুকে ওরা কোঁৎকাই করেছে। স্যারকে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বল। অশেষ অন্ধকারে হারিয়ে গেল।
রীতা কথা বলতে পারছিল না। কোঁৎকাই শব্দের মানে প্রথম ধাক্কায় মাথায় আসেনি। অন্ধকারে অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনি খুলে যায় শব্দের মানে। তখন দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা থাকত...কোঁৎকাই হবে। চুড়ান্ত মানে মৃত্যু, খতম করে দেওয়া। জিষ্ণু নেই। নিজের ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই রীতার। দুরন্ত ভাই-এর জন্য চিৎকার করে কাঁদা যাবে না। প্রেসারের রোগী বাবা সব জেগে যাবে। সব কিছু স্পন্দহীন। স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবির দেহ পড়ে রয়েছে কেবল এক গলির মুখে। দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে আততায়ীর বুলেট। দুরন্ত জীবন এভাবেই শেষ হয়ে যায়।
জিষ্ণু বলত জানিস দিদি, আমরা গাই মাওজেদং-এর গান।
কিন্তু আমার কেমন ধান্দা লেগে যায়– চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান হবে কেন? কেন চারু মজুমদার বা আমাদের চেয়ারম্যান হবে না? আমার মনে হয় চিন্তার দেশী করণ দরকার। সয়েলটাকে কেউ চিনতে চাইছে না।'
তোর কথাবার্তা ভোটপন্থী মতো হয়ে যাচ্ছে না।
তোদের মতো মেয়েদের নিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমার দিদি অন্যদের মতো কথা বলবে এটা আমি আশা করি না। ওদের থেকে তুই কি আলাদা কথা বললি? আমার কথাবার্তায় সংশোধনবাদের গন্ধ পায় ওরা। অশেষদাটাও ঐ দলের। তবে জানিস দিদি, আমি মাঝে মাঝে ওকে চিনতে পারি না। ভেতরে ভেতরে আমাদের লড়াইটা অনেক কঠিন। জানি না কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। জীষ্ণু গম্ভীর হয়ে যায়। তখন ভাইকে ও রীতার বড় অচেনা মানুষ মনে হয়। জীষ্ণু চিনতে পারে না অশেষকে?
ডি,আই.বি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন বাড়িটার উপর নজর রাখে নিখিলেশ বাবু বুঝতে পারবেন। ছেলের চিন্তাধারার উপর তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন না। তাঁর ধারণা সময়টা সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলছে। ঘাত-প্রতিঘাতই বলে দেবে কে ঠিক, কে বেঠিক। কিন্তু সে অনুভব করে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য কেমন ছোট হয়ে আসছে। তাকেও অনুসরণ করে অনেক রহস্যময় চোখ। পিছন ফিরে বারবার দেখতে হয় নিজের ছায়াকে। সেদিন জিরো আওয়ারে ক্লাস নিতে কলেজে ঠিক ন'টায় পৌঁছেছিলেন নিখিলেশবাবু। কলেজ গেট আগলে দাঁড়াল দু'জন লোক। নিজেদের পরিচয় দিল পুলিশের লোক হিসাবে। তাদের বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত–ছেলেকে সামলান। নিজে সংযত থাকুন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলার পরিণাম নিশ্চয়ই জানেন।
মানুষ অদ্ভুত রকমের ভীতু। বিশেষ করে বাবা-মারা। পিতার অন্ধত্ব নিখিলেশ ববি জয় করেছিলেন কিন্তু আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল। কথাটা উঠল রাতে ডাইনিং টেবিলে– জীষ্ণু দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। পড়াশুনোয় মন দাও। শোন, প্রত্যেক বাবাই চায় সন্তানের নিরাপদ জীবন। তোমার মাও রাতে ঘুমোতে পারে না। তা তুমি বোঝ?
কিন্তু বাবা-আমিতো পড়াশুনা ঠিকই করছি। রেজাল্ট কি কখনও খারাপ হয়েছে?
এখানে শুধু পড়াশুনার কথা হচ্ছে না। আমাদের কোন আদর্শের কথা ভাবার দিন নেই। এভাবে আতঙ্কিত দিন যাপন করা যায়, তুমি বল? বয়স হলে বুঝবে কাল্পনিক শূন্যতা কত ভয়ানক জিনিস। আমরা চাই তুমি রাজনীতির সংস্রব ছাড়। এদেশে বিপ্লব টিপ্লব কিছু হবে না।
বাবার দেওয়া লক্ষণরেখা অতিক্রম করেছিল। জিষ্ণু এবং জীবন ঝরে গেল যতা নিয়মেই। তখন জিষ্ণু নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর পি,জি স্টুডেন্ট। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে দু'দল ছাত্রের মধ্রে বড় ধরণের গণ্ডোগোল বেধেছিল সেদিন। সাদা পোশাকের অল্প বয়সী পুলিশ ছদ্মবেশে থাকত ছাত্রদের মধ্যে। তারাই আসল কাজটা করত এ ধরনের অ্যাকশনে। টার্গেট আগেই নির্ধারিত াকত পুলিশের। নিখিলেশ বাবু অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সায়েন্স কলেজের খবর পেয়ে। পরদিন পুলিশ

এসে তুলে নিয়ে গেল রীতাকে। পুলিশের কাছে খবর ছিল রীতার কাছে রিভলবার আছে। বাড়ি তন্ন তন্ন করে পুলিশ খুঁজেছিল জাঁদরেল পুলিশ অফিসারটির নির্দেশেই। কিছু নিষিদ্ধ বই মিলেছিল। কোন অস্ত্র মেলেনি। তারও দু'দিন পর বাড়িতে এসেছিল জীষ্ণু ডেড বডি। পোস্টমর্টেম দেহ ছিন্ন ভিন্ন। এন কাউন্টারে নাকি মারা গেছে। পিঠের দিক থেকে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে খুনি গুলিটা। নিখিলেশবাবু আর তার স্ত্রী শুরু করলেন শূন্য জীবন পথে। প্রতিদিন ছিঁড়তে লাগল তারগুলি।

স্কুল থেকে বেরিয়ে রীতা বাস স্টপের দিকে যাচ্ছিল, ফেরার কোন তাড়া নেই। বাড়ি গেলেই হল। গিয়ে তো সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ। স্কুলে থাকলেই ভাল থাকা যায়। বাস স্টপজে তখনও অপেক্ষা করছে তরুদি, তারই স্কুলের শিক্ষিকা। তরুদির বাসটা আগে এলো। এমনই হয় প্রায়দিন। রীতাদের রুটে বাস একটু কম। এমন সময় একটা ছেলে তার স্কুলের দিক থেকে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এলো– আপনার নাম রীতা সাগরী।

হ্যাঁ কেন বলত ভাই।

আমি আপনাদের স্কুলে গেছিলাম। দারোয়ান বলল বাসস্টান্ডে পেয়ে যেতে পারি। অশেষদা আপনাকে এ চিঠিটা দিয়েছে। ছেলেটা চলে যাচ্ছিল– ফিরে এসে বলল- অশেষদাকে একটু বলবেন, চিঠিটা ঠিক সময়ে পেয়েছেন। যা রাসভারী লোক। না হলে কিন্তু আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

অশেষের চিঠি– রীতা আজ বিকালে বাড়ি থেকো। আমি একবার যাব তোমাদের বাড়ি। অসুবিধা থাকলে ফোনে জানি ও। ফোন নম্বর...।

সেই হাতের লেখা। খুব একটা পালাটায়নি। এখনও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে অশেষের দু'একটা চিঠি। এখনও অনেক চিঠির কথা মনে পড়ে...শোষণহীন পৃথিবীতে তুমি আমি উড়ে বেড়াব এক জোড়া পায়রার মতো, আজ এলে প্রশ্ন করবে রীতা– অশেষ পায়রার পালকগুলো গেল কোথায়? তার দেহ আছে? মন আছে? মৃত পাখির সাথে ওড়া যায় আকাশে?

অশেষ এলো কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায়। অশেষ ধূতি পাঞ্জাবী পরেছে। এটাই এখন ওর ব্রান্ডেড পোষাক। মিডিয়ার কল্যানে আরো পরিচিত। রীতা সাদা আটপৌরে শাড়িতে দরজা খুলে দিল। অশেষ সিঙ্গল সোফায় বসল। এই সোফাটায় বসতেন নিখিলেশ বাবু। অলিখিতভাবেই এ বাড়িতে নিয়ম ছিল ওখানে অন্য কেউ বসবেন না। বাবার প্রতি ভালবাসা স'ম্মান বোধ থেকেই চেয়ারটা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেমন স্মৃতির মতো চেয়ারটা আছে এতো বছর পরেও।

তখনও কেউ ওখানে বসে না। ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার রাখা হয়। অশেষ তাহলে ভুলে গেল সব। রীতার সারা শরীরে ক্ষোভ। তুমি যত বড় হও, সব আসন তোমার নয়। অন্ততঃ এটাা গদিও নয়, যে ইচ্ছা মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো বসে পড়বে।

অশেষ তুমি এদিকে এসে বসো। ওটা বাবার আসন।

ও হ্যাঁ , এই দ্যাখো। আমার মনে রাখা উচিত ছিল। অশেষ একটা চেয়ার টেনে বসে।

রীতা আবার একই কথা বলছি। আমরা পিছনটাকে কি ভুলতে পারে না। ভুলতে পারাটা নির্ভর করে মানুষের গতিময় জীবনের উপর অশেষ। আমি কি পেয়েছি জীবনে যখন যা হওয়ার কথা ছিল তার সাথে তাল মিলাতে। তা হলে আমার আর থাকে কি অতীত। দেখবে আমার কাছে অতীত এখনও কেমন অক্ষত অবস্থায় আছে। দেখবে অশেষ? অশেষের উত্তরের সময় না নিয়েই রীতা ঘরের মধ্যে চলে গেল। রীতার সারা শরীরের ভাষা পাল্টে গেছে। ঘরের মধ্যে যেতে যেতে রীতা অনেকটাই অদৃশ্য ছায়ায় আবৃত্ত। অশেষের কাছে আর নিজের তালুর মতো চেনা নারী মনে হচ্ছে না। যে অতীতকে ভোলে না সে সত্যিই ভয়ঙ্করের পূজারী। রীতা ফিরে এলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। অশেষকে তাক করা রিভলভার–অশেষ, তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস?

ট্রিগার থেকে আঙুল সরা ও রীতা। ওতে এখনও গুলি আছে। বিপদ ঘটে যাবে– অশেষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ।

তা হলে চিনতে পেরেছ অতীতকে। হ্যাঁ, এখনও পাঁচটা গুলিই আছে বাকী, একটা গুলি নেই। তার হিসাব তুমিই জান। আমার অনুমান আমি জানি। আমি আর বিশ্বাস করি না বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। আমি বিশ্বাস করি নিয়তিকে। না হলে তুমিই বা কেন ফিরে আসবে মৃত্যুর মুখে। সবার আগে শুনেছি সবাই সত্যি কথা বলে– তুমি একটা কথার উত্তর দেবে অশেষ। জিষ্ণুকে কে মেরেছে?

অশেষ পাঞ্জা লড়ছে অনেকগুলো প্রশ্নের সাথে, মৃত্যুর সাথে। এখন আর সোনালী রোদ নেই,আকাশ নেই। কোলাহলে চেনা সঙ্গী খোঁজার তাড়া নেই, অতীত বর্তমানের মাঝে শূন্য হয়ে যাচ্ছে অশেষের।

জানি এর উত্তর তুমি কোনো দিনই দেবে না। তবু তোমার জেনে যাওয়া উচিত আমি কতটুকু জানি। জিষ্ণু যে রাত্রে খুন হল, সেই রাত্রে তুমি প্যাকেটটা দিয়ে গেল। রাতে কোনো হুঁস ছিল না। আর কি আছে। সকালে খুলে আঁৎকে উঠেছিলাম। কি করি এটাকে নিয়েই বাড়ির পিছন দিকটায় নারকেল গাছটার গোড়ায় পুঁতে দিয়েছিলাম। বডি আমার আগে আগেই। বডি এলো পুলিশে পুলিশে ছয়ালাপ। বাড়িতে নাকি অস্ত্র আছে। খানা তল্লাসির নামে চলল পুলিশি লুটতরাজ। আমাকে অসহায় মৃত ভাইয়ের দেহ আসার আগেই তুলে নিয়ে গেল ওরা। আলো আঁধারি কমে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার জেরা করছিল–রিভলবারটা কোথায় রেখেছ বোন।

না, আমি জানি না কিছু ! আমরা মেয়েরা লতার মতো। জিষ্ণু নেই। অশেষকেও কি করে হারাই। জান, আমি কি বোকা তখনও ভাবছি, অশেষ ফিরে আসবে একদিন। মুক্তি তো পেতেই পারে যে কোনদিন।

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার নম্রভাবে বলল– আমি জানি। তোমার কাছেই রিভলভারটা আছে। আমি তখনও যুক্তি দিতে চেষ্টা করছিলাম– আমার মতো একটা মেয়ের কাছে কেন থাকতে যাবে রিভলবার। পাশে দাঁড়ানো পাঁচ সাতজন পুলিশ গোঁফের ফাঁকে হাসছে। সে বলল-সতী বোনটি দেখছি কিছু জানে না। দেতো মাগির শরীরে তোদের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দে। পুরুষ মানুষের সুবিধে ডাণ্ডার মতো অস্ত্র নিয়েই জন্মায়। এক-দুই-তিন-চার। ছিঁড়ে যাচ্ছে শরীরের তন্ত্রী। অফিসার চুরুট টেনে যাচ্ছেন নির্বিকারে। ছিঁড়ে যাচ্ছে তন্ত্রী। পাঁচ-ছয়। ঘরের মধ্যে যে বাল্বটা তারে ঝুলেছিল সে লাঠির এক পিটানে ভেঙ্গে দিয়ে বেড়িয়ে গেল। সাত...

আমি মুক্তি পেয়েছি। তুমিও ফিরে এসেছ অশেষ। মেয়েদের শরীর ছাড়া অন্য কিছু ভেবেছ কিনা আমার জানা নেই। আমার কাছে কি চাইতে এসেছ তুমি একবার দেখে নাও। রীতা অশেষের সামনেই সমস্ত বস্ত্র একে একে খুলে ফেলল। স্তন দুটোয় মালার মতো চুরুটের ছ্যাঁকার দাগ। দু'পায়ে জঙ্ঘা পুড়ে অনুর্বর মরুভূমি। তোমার চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলে অশেষ? তোমার ওই অস্ত্রের জন্য আমার সারা শরীর পুড়েছে। আমার ছোট ভাই... কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে রীতা।

রীতা তুমি শোধ নাও। আর বাঁচার মানে হানা। কালঘামের জল শরীরে বয়ে যাচ্ছে। তির তির না অশেষ! তুমি চলে যাও। তুমি তো অনেক আগেই মরে গেছ।

সসীমকুমার বাড়ৈ, কোলকাতা, ২০/০১/২০০৭